বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"

[illegible] নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, "জন্মভূমি" কার্য্যালয় হইতে
গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বাণীপ্রেস;
[illegible]৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট,—কলিকাতা
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত

পিতৃদেব মহাশয়ের মহনীয় শ্রীকরকমলে

"বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্র"-নামক পুস্তক

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসৃষ্ট

হইল।

ভূমিকা।

কলিকাতায় "চৈতন্য-লাইব্রেরী"র বিজ্ঞাপিত "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার প্রভাব" ইতি-শীর্ষক পুরস্কার-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। "বান্ধব" সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধটীর পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষায় মল্লিখিত প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯০৪) তারিখে "চৈতন্য লাইব্রেরী"র পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় এডমণ্ড এলিস্ (The Hon'ble MAJOR GENERAL SIR EDMOND R. ELLES, K. C. B., K. C. I. E.) মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে উপরি-উক্ত প্রবন্ধের পুরস্কার-স্বরূপ "পদক" প্রদান করেন। প্রবন্ধটি, সর্ব্বপ্রথমে মৎ-সংশ্লিষ্ট "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত বহু গ্রন্থ-প্রণেতা পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও "রঙ্গালয়" সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়দ্বয় পরীক্ষার পর পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে ভ্রম-সংশোধন পূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। "সাহিত্য-সভা"র সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও বিশেষ যত্নসহকারে আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যে সকল পূজ্যপাদ মহোদয়গণের সস্নেহ শুভাশীর্ব্বাদে আমি চিরকৃতজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে আর নূতন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি করিব? সুকবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু-উপলক্ষে আমি যে একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলাম, এবং সাহিত্য-সভার যত্নে "হেমচন্দ্রের স্মৃতিসভা"য় মদ্‌বিরচিত যে শোকসঙ্গীতত্রয় গীত হইয়াছিল, তাহাও এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। পূজ্যপাদ সুবিখ্যাত বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিশারদ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয় কবিতাটি পাঠ করিয়া তাহার স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া আমাকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন।

"চৈতন্য-লাইব্রেরী"র বিজ্ঞাপিত—"ভারতে দুর্ভিক্ষ, ইহার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আরও একটি পুরস্কার-প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সিভিলিয়ান্ মনস্বী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন; তাঁহার মন্তব্যেও মল্লিখিত প্রবন্ধটি উত্তম ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। বিগত ১৯০২ খৃষ্টাব্দ ২০শে জানুয়ারি তারিখে উক্ত লাইব্রেরীর দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় রাজস্ব-সচিব সার এডওয়ার্ড ল The Hon'ble SIR EDWARD LAW, K. C. M., G. C. S. I. মহোদয়, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আরও একটি পদক প্রদান করেন। "চৈতন্য-লাইব্রেরী"র কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে দুইখানি পদক প্রদান করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উৎসাহিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন। এই স্থলে আর একটি বক্তব্য এই যে, "বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্র" সঙ্কলনকালে যে সকল পত্র ও পত্রিকা হইতে কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যাংশ সম্বন্ধে মতামত সংগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য লেখক মহোদয়গণের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কবিবর হেমচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত কাব্য-জীবনের সৌসাদৃশ্য সহ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তগুলি অদ্য সুধীসমাজে প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে যদি কাহারও হৃদয়ে স্বর্গীয় মহাকবির কাব্য-জীবনের নিগূঢ় ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

জন্মভূমি কার্য্যালয়। ৩৩ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১লা আশ্বিন, ১৩১১ সাল।	বিনয়াবনত শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
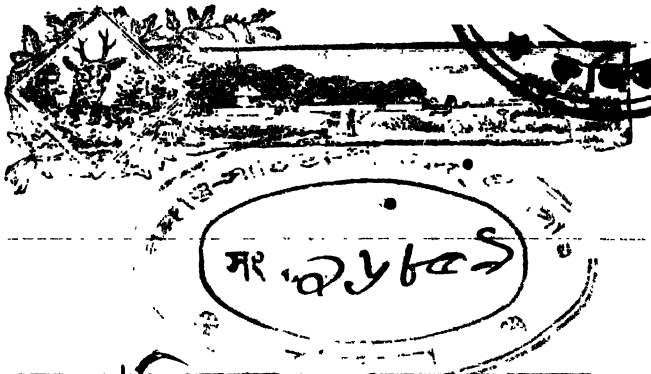
বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ আছে, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা-প্রভাব, হেমচন্দ্রের সৎ-শিক্ষা এবং হেমচন্দ্রের মহাগুণাবলীর বিষয় তাঁহারা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। হেমচন্দ্র ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। তৎপরে মাতামহের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরে অবস্থিতি পূর্ব্বক উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। তখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হেমচন্দ্র তৎকালীন নিয়মানুসারে জুনিয়ার পরীক্ষা প্রদান করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একত্র সিনিয়র ও এফ, এ, এই উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এক বৎসরমাত্র পাঠ করিয়াই তিনি অর্থাভাব বশতঃ কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, "মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে" মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণী হইয়াছিলেন। কেরাণীগিরি করিতে করিতে তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অল্পদিন

পরেই "কলিকাতা ট্রেনিং" স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাবড়া ও শ্রীরামপুরে মুন্সেফের কার্য্য করেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে হেমচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন; ক্রমে ক্রমে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল হইয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। সর্ব্বজনে তাঁহার অনুগ্রহ সমান ছিল। কিঙ্করকুলকেও তিনি আত্মীয় স্বজন বলিয়া ভাবিতেন।

বঙ্গের সাহিত্য-গৌরব প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। যে সাহিত্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় কবি জন্মগ্রহণ করিতে পারে, সে সাহিত্য যে গৌরবান্বিত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সে গৌরববোধ কয় জনের আছে? কবিকে বুঝিতে হইবে, কাব্যের রসাস্বাদন করিতে হইবে, তবে গৌরব বোধগম্য হইবে। অতিসান্নিধ্যে দর্শনশক্তির ব্যাঘাত ঘটে; নয়নের উপর কোন সামগ্রী রাখিলেও তাহা ভাল করিয়া দেখা যায় না। ভাল করিয়া কিছু দেখিতে হইলে একটু দূরে রাখিতে হয়। কবি হেমচন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার এবং তাঁহার কবিত্বের সম্যক্ বোধ আমাদের হইতে পারে না। ভবিষ্য পুরুষগণ এ বিচার করিবেন। তথাপি কাছে রাখিয়া তাঁহাকে আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহারই একটু পরিচয় দিব।

অর্থ অনেকের হয়, বিদ্যা অনেকের হয়, সৎকার্য্যে ব্যয়ও অনেকে করেন, কিন্তু তাঁহাদের গুণের পুরস্কার অন্যপ্রকার; তাঁহাদের খ্যাতিও অন্য প্রকার। বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ধনশালী পুরুষ হইয়া যিনি বীণাপাণির পূজায় সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিতে পারেন, 'কবিনাম' লইয়া যিনি মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াও অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, গুণ-গৌরব আর একপ্রকার। কবি মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিয়া স্বর্গসুখ উপ-ভোগ করেন; দেশের সাহিত্য-সংসার তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া চিরদিন তাঁহার গুণগান করেন। কবিবর হেমচন্দ্র সেই গৌরবেই গৌরবান্বিত। এ দেশীয় সাহিত্য-সংসারকে—কাব্য-সংসারকে—তিনি অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভা-প্রকাশের প্রথমেই হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠকের সহিত পরিচিত। কাব্যানুরাগি-পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে একজন প্রতিভাশালী মহাকবি ও মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

কবিবর হেমচন্দ্র স্বদেশ-প্রেমিক, স্বদেশ-প্রিয়, স্বদেশ-ভক্ত, স্বদেশের হিতব্রতে অকপটভাবে অনুরক্ত ছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যেরূপ অচলা ভক্তি ছিল, জাতি-ভাষার প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ অচলা ভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিভা-প্রসাদে হেমচন্দ্র বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বীর-করুণাদি সর্ব্ববিধ রসের সংস্ফুরণে তাঁহার কল্পনাশক্তির বিশেষ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ছন্দঃ-সারল্য, শব্দ-লালিত্য ও ভাব-সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববিষয়েই তিনি সমধিক প্রশংসনীয়। অধিকাংশ কাব্যেই তাঁহার স্বদেশানুরাগিতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার কল্পনার প্রথম ফল—"চিন্তা-তরঙ্গিণী"; দ্বিতীয় ফল—"ভারত-সঙ্গীত"। স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, এই তিনটি গুণের অতি রমণীয় চিত্র এই ভারত-সঙ্গীতে বিদ্যমান; কবিত্বের লালিত্যেও "ভারত-সঙ্গীত" রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী; অক্ষরে অক্ষরে ইহা সুধাবর্ষণ করিতেছে;—সর্ব্বগুণ-সমষ্টিতে "ভারত-সঙ্গীত"কে বঙ্গীয় কাব্য-সরোবরের শতদল পদ্ম বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিরচিত বীরবাহু, চিত্তবিকাশ, আশা-কানন, ছায়াময়ী, বৃত্রসংহার, কবিতাবলী, দশমহাবিদ্যা, বিবিধ কবিতা, রোমিও জুলিয়েট, নলিনী-বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য কবিতা, কাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যে তাঁহার আন্তরিক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বৃত্রসংহার ও বীরবাহু তাঁহার মহাকাব্য। মনোভাবের সহিত কবিত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন। বাস্তবিকই সোণায় সোহাগা!

হেমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ন্যায় প্রতিভা কেবল বঙ্গদেশে কেন, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উন্নত চরিত্রের আদর্শ চিত্র-প্রদর্শনে, কল্পনার উচ্চতায়, পবিত্রতায়, ভাব-সন্নিবেশের পারদর্শিতায়, চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রদর্শনে হেমচন্দ্রের প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল।

কবি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার প্রকৃত গুণের নিরপেক্ষ বিচার হয় না; সে বিচার করিতে কাহারও মন যায় না। পাঠক একাগ্র-চিত্ত হইয়া, তাঁহার সরল কবিতাগুলি পাঠ করেন, "উত্তম হইয়াছে"

বলিয়া প্রশংসা করেন, রসের কথা পাঠ করিয়া আমোদ প্রকাশ করেন; গুরু-কবিতা পাঠ করিবার সময় অভিধান অন্বেষণ করেন, অভিধানে শব্দার্থ পাইয়া কবির রসজ্ঞতার প্রশংসা করেন, এই পর্য্যন্ত সারগ্রহণ। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বা এক একস্থানে দুই একটা দোষ দেখাইয়া নিন্দা করেন। বস্তুতঃ কবির জীবদ্দশায় প্রকৃত গুণের বিচার হয় না; কেহই তখন প্রকৃত বিচার করেন না; এটি যেন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয়। কবির লোকান্তে বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে। হেমচন্দ্র মরিয়াছেন, এখন তাঁহার কবিতার দোষগুণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় নহে, বঙ্গের সীমান্ত ব্যাপিয়া মহান্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, বঙ্গের কোনও কবির জীবনান্তে তাঁহার কবিতা লইয়া চতুর্দ্দিকে এরূপ বিচার, এরূপ আন্দোলন, কস্মিন্ কালেও সংঘটিত হয় নাই।

হেমচন্দ্রের কাব্যের বিচার হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে, হেমচন্দ্র কোন্ শ্রেণীর কবি ছিলেন? তাঁহার কবিত্বশক্তি কি প্রকার ছিল? তাঁহার বিরচিত কাব্য-পাঠে কোনও ভাবুক-চিত্ত উদ্বোধিত হইয়াছে কি না?

বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এই সকল তর্কের এখন বিচার হইতেছে। হেমচন্দ্র-বিরচিত কাব্য ও কবিতাদি পাঠে যিনি যে প্রকার ধারণা করিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেছেন। কেহ বলেন—কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারাদি অমিত্রাক্ষর কাব্য। মাই-কেলের আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" ও "বীরবাহু" মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন—রাজনীতি-ঘটিত কবিতা-কলাপেই হেমচন্দ্রের সবিশেষ দক্ষতা ছিল। কেহ বলেন—সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কেহ বলেন—আর্য্য-সমাজ সম্বন্ধে কেহ বলেন—জন্মভূমির গৌরবসম্বন্ধে তাঁহার কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—হেমচন্দ্রের কবিতায় সুরুচিসঙ্গত হাস্য, রঙ্গ ও রসিকতার একান্ত অভাব। এই প্রকার নানামুনির নানা মত। বস্তুতঃ এইরূপ বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করিলে, কেবল অকারণ পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা হয়। তাদৃশ বিচার, কবির জীবদ্দশায় কোনও সমালোচনী পত্রিকায় প্রকাশ পাইলে বরং শোভা পাইতে পারিত। কবির জীবনান্তে যখন তদ্বিরচিত কাব্যের বিচার হইতেছে,

তখন সেই বিচারে মরালবৎ সারগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কবিতার গৌরবে, ভাবের গৌরবেই—কাব্যের বিচার ব্যবস্থা-সঙ্গত। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সেরূপ বিচারের পন্থা প্রায় কেহই অবলম্বন করিতেছেন না।

আর এক কথা। হেমচন্দ্রের কবিতায় কেহ কোন নূতনত্ব দর্শন করিয়াছেন কি না? কাহারও হৃদয়ে সেই বীণাস্বরের প্রতিধ্বনি হইয়াছে কি না? স্বরের সঙ্গে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে কি না? তাঁহার সেবায় বঙ্গসাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে কি না? এ সকল বিষয়ের বিচার কেহই করিতেছেন না। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়গুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া অনেকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, হেমচন্দ্রের কবিতায় কেহই যেন কোন প্রকার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব দর্শন করেন নাই, অথবা প্রতিভার দীপ্তিও যেন কাহারও জ্ঞানচক্ষে বিভাসিত হয় নাই। একি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত! কবির পবিত্র দেহের সহিত কবির কাব্যামৃতও কি ভস্মীভূত হইয়াছে? মাইকেলের আদর্শদর্শনে হেমচন্দ্রের কাব্য-রচনা, একথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বভাব-কবির জন্ম অসম্ভব, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্র স্বভাব-কবি; তাঁহার কবিতার উচ্চভাব ও প্রাঞ্জলতা দর্শনে ভাবুক ব্যক্তি মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। একজন স্বভাব-কবি আর একজনের কবিতার অনুকরণ করিয়া কবি-নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহার কবিতার কিছুই বিশেষত্ব নাই, এরূপ অগ্রাহ্য কথা কদাচ স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে মাইকেল মধুসূদনের বহু পূর্ব্বকালীন মহাকবিগণের মহাকাব্যগুলিকে রসাতলে দিতে হয়; মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতির অভ্যুত্থান সময়ে মাইকেল মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করেন নাই, অতএব তাঁহাদের রচিত কবিতাবলী কদাপি কবিতা নামে গণ্য হইতে পারে না, একথা বলিতে হয়। এই কথার উপর দৃঢ়তা রাখিলে হেমচন্দ্রকে নূতনত্ব-শূন্য বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবল ও প্রতিভার কৃপা ব্যতীত প্রকৃত কবিত্বশক্তি জন্মে না; আবার প্রতিভার এমনই মোহিনী শক্তি যে, প্রতিভার প্রসাদে এক একজন নিরক্ষর লোকেও উচ্চ কবিত্ব লাভ করিয়া থাকে। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বর্ত্তমান। রূপচাঁদ পক্ষী, ধীরাজ বাহাদুর, প্যারী কবিরত্ন, পানা-উল্লা মুসলমান, প্রাচীন ওস্তাদি কবিতার রচয়িতৃগণ এবং

নিম্নকল্পে আধুনিক তরজাওয়ালারা এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের নাম দস্তখত করিতে জানিতেন না, কেহ কেহ "ক" অক্ষর দর্শন করিলে ক্রন্দন করিতেন, কিন্তু তাহাদের কবিতায় এত রস, এত ভাব, এত লালিত্য যে, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ও কবিগৌরব-প্রাপ্ত কবিগণ প্রায় কেহই সেরূপ ভাব, রস, শব্দবিন্যাস স্বপ্নেও ভাবনা করিতে অক্ষম। এ দৃষ্টান্তের সম্মুখে স্বভাব-কবি সুপণ্ডিত হেমচন্দ্রের কবিতাকে নূতনত্বশূন্য বলা অনেকটা দুঃসাহসের কার্য্য। কাব্য-রসাস্বাদনে যাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হয়, সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ মহারথগণ, যথার্থ বিচারে যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারা সকলেই হেমচন্দ্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দান করিয়াছেন, কিন্তু এখনকার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দেখিয়া মনে হয়, হেমচন্দ্র যেন কবিনামের অযোগ্য। হেমচন্দ্র, মাইকেলের 'আসল কাব্য' দেখিয়া 'নকল' করিয়াছেন মাত্র। 'নকল' কাব্য পাঠ করিতে 'আসলের' দিকে চিত্ত ধাবিত হয়, কতকগুলি লোকের এরূপ ধারণা। সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক, একথা আমরা সহস্রবার বলিব।

তর্কের কথা দূরে রাখিয়া, বঙ্গীয় কবিগণের দৃষ্টান্তই অগ্রে ধরুন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস কবি ছিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কবি ছিলেন; মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রভৃতি কবি ছিলেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। ইহাঁদের কাব্যের অনুকরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সংসারে কয়জন প্রকৃত কবি বলিয়া গণ্য হইতে সমর্থ হইয়াছেন? হেমচন্দ্রের প্রতিভা অসাধারণ ছিল। হেমচন্দ্রের কবিতায় কবিত্ব, লালিত্য, মধুরত্ব, স্থায়িত্ব—নূতনত্ব ও প্রচুর,—ইহাই আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

হেমচন্দ্রের কবিতাসম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"এখনকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্য্য বলিতেছেন ;—

“বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরব্য মিসর, পারস্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস।
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা—
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

* * * *

কিসের লাগিয়া, হলি দিশে-হারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ, তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও।

ঐই দেখ! সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

স্বজাতীয়-অধঃপতন-দর্শনে দুঃখিতচিত্তে জাতিকে ভর্ৎসনা করিয়া, কবি আর একস্থানে বলিয়াছেন;—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?"

ভারত-সঙ্গীত।

হেমচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার রচিত, দেশপ্রসিদ্ধ ভারত-সঙ্গীতে। ভারত-সঙ্গীত পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? তাঁহার এই মনঃপ্রাণ-হর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে কোন্ পাষাণ প্রাণে না জাতীয় প্রেম জাগরূক হইয়া উঠে? ভারত-সঙ্গীত ইং ১৮৭২ সালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবির "চিন্তা-

তরঙ্গিণী"নামক একখানি পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দে ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশিত হইলে জনসমাজে সমাদৃত হয়, এবং ১২৭১ সালে উক্ত উৎকৃষ্ট কাব্যখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (এফ, এ) উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যপুস্তকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রাজনারায়ণ বাবুর মতে হেমচন্দ্র বিরচিত সকল কবিতার মধ্যে 'গঙ্গার উৎপত্তি' সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সনাতনধর্ম্মভাবোদ্দীপক। তাহারও কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

১

"ঋষি কয়জন সন্ধ্যাসমাপন
করি' একদিন বসিলা ধ্যানে,
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা,
কহিতে লাগিলা আসি' সেখানে।

২

রাখ ঋষিগণ, সমূলে নিধন
মানবসংসার হ'ল এবার,
হ'ল ছারখার ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।

৩

শু'নে ঋষিগণ ক'রে দৃঢ়পণ,
যোগে দিল মনঃ একান্তচিতে,
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা,
করিতে লাগিল মানব-হিতে।

৪

মানবমঙ্গলে ঋষিরা সকলে,
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে,
হইল অসীম করুণোদয়।

৫

দেখিতে দেখিতে হ'ল আচম্বিতে,
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির-নক্ষত্র তিমিরে একত্র,
অনল-বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

৬

ব্রহ্মাণ্ডভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিতপ্রায়,
নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার,
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

৭

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি,
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদ-নদী-জল হইল অচল,
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

৮

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে,
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে,
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

৯

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়,
ব্রহ্মসনাতন রাতুল চরণ,
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

১০

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি,
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়া'য়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

১১

হায়! কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্মসনাতন চরণ হ'তে,
ব্রহ্মা কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে,
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।"

ইহাতে আর্য্য গার্হস্থ্য আশ্রমের সকল সারমর্ম্মের উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমৃত-কলস উত্থিত হইয়াছে। পণ্ডিত ও পুরনারী সমাদরে—আগ্রহসহকারে—হেমচন্দ্রের গঙ্গার উৎপত্তি পাঠ করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া, কেহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এতাদৃশী কবিতার যিনি রচয়িতা, তাঁহাকে প্রণাম করি।

হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের বিয়োগ-গীতিতে "বঙ্গদর্শনের" পবিত্রাঙ্ক উচ্ছ্বসিত করিবার সময় তাঁহাকে প্রসিদ্ধ সাহিত্যবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র? মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" * স্বদেশপ্রেমিক মহাকবি হেমচন্দ্র এখন আর নাই। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত মহাকবির সিংহাসন, প্রকৃতস্বদেশ-প্রেমিকের সিংহাসন, অধুনা শূন্য।

* বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০।

হেমচন্দ্র কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় (প্রায় ৪২ বৎসরকাল) সমভাবে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন,—অপরূপ রত্নালঙ্কারে মাতৃভাষাকে সাজাইয়াছিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা-অনুবাদক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতাগুলি সুদীর্ঘকাল ব্যবধানে পাঠ করিয়াছি; সুতরাং কবিবরের কাব্যগ্রন্থসমূহের যথাযথ সমালোচনা, আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে, হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে,—যে মধুরতা আছে,—তাহা অ-বর্ণনীয়। এমন কি, তেমন মাধুর্য্য মাইকেলেও নাই। কবিদ্বয়ের তুলনা অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে।"

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি, বঙ্গের কবিতার রীতিপ্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছেন; করুণরসের একতন্ত্রীটা ছাঁটিয়া ফেলিয়া ইঁহারা গম্ভীর তানপুরীর সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন।"

বর্ত্তমানকালে স্বজাতীয় জীবনে যে অভিনব স্ফূর্ত্তি ও একতার কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষণ চতুর্দিক্ হইতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার প্রাগ্‌ধ্বনি হেমচন্দ্রের জাতীয়-সঙ্গীত হইতে প্রাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরং"—সত্যেন্দ্রনাথের "জয় ভারতের জয়"—কবিবর রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমোহিনী"—সেই ধ্বনির মন্দীভূত সুন্দর ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

প্রেমের কবিতাতেও হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের 'নিরাশ প্রেমের' কবিতাগুলি, বঙ্গীয় যুবক ও কুলবধূগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে চন্দ্রোদয় দেখিয়া—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কেন হেন বারে বারে, কাঁদাইতে অভাগারে,
আকাশ-মাঝেতে কেন শশী দেখা দেয় রে!"

অনেকে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

হেমচন্দ্রের রুচি মার্জ্জিত, প্রণয়ের চিত্র পঙ্কিলতা-বর্জ্জিত। অন্তঃসার-শূন্য বাক্যবিন্যাস হেমচন্দ্রের কবিতায় নাই। তাঁহার হৃদয় কপটতা শূন্য।

তাই সেই হৃদয়, সরল প্রাণের সরল কথা সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রকৃত ভাবুকহৃদয়, কথার আড়ম্বর ভুলিয়া, ভাবের উচ্চতায়—গভীরতায় বিমুগ্ধ হইয়া, বিরহ-ব্যাকুলতায় চিরদিনই বলিবে :—

"দেখ প্রিয়ে! সূর্য্য-আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
স্ববর্ণের পাতা যেন, ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের'পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে, নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে! সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্যমনে নিরশনে এ অভাগা রহিল॥"

হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন,—জাতীয় চরিত্রগঠনে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন,—অক্ষয়-কীর্ত্তিলাভে আপনাকে যেরূপ যশস্বী ও বঙ্গভাষাকে যেরূপ জগৎ-পূজিতা করিয়াছেন,—সারগ্রাহী লোকের হৃদয়ে তাহা অক্ষয় রেখায় রক্ষিত—অঙ্কিত। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কখন নিস্তেজঃ হয় নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশপ্রেমে বিহ্বল হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" গাইয়াছিলেন;—আবার ইং ১৮৭৫ সালে স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখনও 'ভারতভিক্ষার' প্রতি পঙ্‌ক্তিতে হেমচন্দ্র, স্বদেশানুরাগে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন;—

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে,
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি' বেদ-গান,
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া,
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া,
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি' ভূমণ্ডলে,
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে,
খুলিয়া দেখা'ত মনুজ-সন্তানে,
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল,
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।
যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি'
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে স্ব-কপিলবস্তে,
শাক্যসিংহ যবে, ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখনো তাহারা ঘৃণিত নহে।
তাহাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের,
হৃদয়ে জড়া'য়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়,
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।
হে কুমার! মনে রেখো এই কথা,
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর,
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,

কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে !”

কেবল ইহাই নহে,—মৃত্যুকালাবধি হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের প্রবাহ সমভাবে বহিয়াছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কায়িক—বাচিক—মানসিক—বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, এমন কি, পরিশেষে চক্ষুরত্ন হারাইয়া, অস্থির হইয়াও সেই স্বদেশ-প্রেমিক একদিনের জন্যও স্বদেশানুরাগ পরিহার করেন নাই। শেষে তিনি জগৎপতির নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন :—

“হে জগৎপতি ! দাসের মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা-প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ,
যেখানেই থা’ক—যেখানেই যা’ক,
যতই সম্মান যেখানেই পা’ক,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি-স্নেহ।”

হেমচন্দ্র, গীতি-কবিতায় একাধিক সুললিত ছন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার “বিবিধ কবিতা” “কবিতাবলী” প্রভৃতিতে কল্পনার বিকাশ, সুললিত-পদবিন্যাস, শব্দমাধুর্য্য, ছন্দোনৈপুণ্য প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক কবিতায় একটি অন্তর্নিহিত গভীর সুর যেন সর্ব্বদা জাগিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক কবিবরের স্বদেশ-প্রেমিকতা এতই উচ্চতমা, এতই সুমহতী, এতই সুগভীরা যে, প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের এ বঙ্গদেশ তাঁহার সে উচ্চ উদ্দেশ্য ও মহতী স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণভাবে অনুভব করিতে অশক্ত। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া দেশবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

“তোমাদের দিবাসন্ধ্যা, প্রাতঃকাল রজনী।
সকলি সমান জ্ঞান,   আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়,   ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষী তুষ্ট হবে তখনি !

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না বল দিল বিধি? ধরিতে ধরার নিধি—
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।"

বাস্তবিকই আমাদের কিসের অভাব? জীবের জীবনদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্তই তো দিয়াছেন:—

দিয়াছে এতই এরে, কখন স্বপনে
ইয়োরোপ না হেরে তায়,
হে কোথা সেথায়—
এমন পর্ব্বত, নদ, এমন দারু, নীরদ,
এত খনিজাত ধাতু; এত শস্যরতনে?
কোথায় সেখানে হায়, হেন রশ্মি তপনে?
এত জাতি ফুল ফল, এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশি-কিরণে!"

এ সকল সুখসমৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের এক মহান্ অভাব আছে, সে অভাবের নিমিত্ত আমরা চিরলাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত হইতেছি তাই ভারতভূমিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন;—

"চিরদুঃখী আজি চির-পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
অত্যন্ত অভাগী অনাথা দুর্ব্বলা
ভজন-পূজন যাগ-মুগধা।"

প্রকৃত অভাবের প্রকৃতিসম্বন্ধেও কবি বলিতেছেন;—

"সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি;
আমাদের হৃদিতলে, সে স্রোত নাহিক চলে,
আশ্রয় করিয়া যায়, পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়,
বাঁচিতে মরিতে হায়, জানি না রে কেবলি।"

স্বর্গ গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
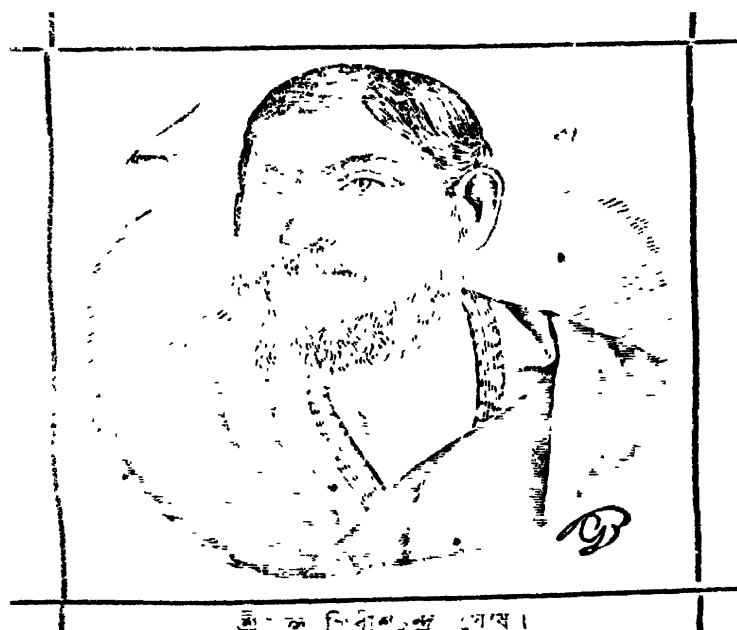
বস্তুতঃ, কবির এই উক্তি, অতীব সত্য, বড় মর্ম্মস্পর্শিনী। আমরা বাঁচিতেও জানি না,—মরিতেও জানি না। যে জাতি বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিতে জানে :—

"এ মর্ত্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি
একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি' থাকে নিজ-বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরিষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না'ক ভয় ;
করে না কখনও পাদ্য-অর্ঘ্য-দান,
পর-পদতলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি ক'রে ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয়।

*   *   *   *

একতাই মর্ত্ত্যে মানব-সম্বল,
একতা-বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর।
সে ধন-বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবি-নে পাবি-নে,—
দিবস-শর্ব্বরী সকলি ঘোর।"

কবি আমাদের একতার অভাব ও অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অভাব-মোচনের উপায় এবং যে সাধনের প্রয়োজন, তাহাই কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "জীবনসঙ্গীতে" তিনি গাহিয়াছেন :—

"সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব!
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে', ওহে জীব ! অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্ ;
সঙ্কল্প সাধন হ'বে, ধরাতলে কীর্ত্তি র'বে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় ;
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হ'ব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে ;
সঙ্কল্প ক'রেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হ'য়ে নিজ নিজ কাজে।"

আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটি প্রধান দোষ, কপটতা। আমরা আমাদিগকে আপনা আপনি বড় স্বার্থশূন্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। তামসিক ভাবকে গোপনে রাখিয়া সাত্ত্বিক ভাবের ভাণ করিয়া থাকি ; কিন্তু দেশহিতব্রতে এই স্বার্থ, প্রাণপণে পরিত্যাগ করিতে হইবে :—

"যে মন্ত্র-সাধনে সুপটু উহারা,
সেই বীরব্রত একতার ধারা,

সে সাহস—সে উৎসাহ-ধারা,
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখ,—
তবে অগ্রসর হৈও কভু আর,
করিতে এরূপে স্বজাতি-উদ্ধার,
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাক।"

(মন্ত্রসাধন।)

ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার উপায় তাঁহার মতে কেবল ইংরাজগণের ভারতবাসীকে প্রীতির চক্ষে দেখা। তাই তিনি ভারতমাতার মুখ দিয়া বলাইতেছেন :—

"আমি বৎস! তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,—
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তা'দের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের
শুনা'য়ে আশ্বাস মধুরস্বরে ॥
বৃটিশ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিম্বা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।"

হেমচন্দ্রবিরচিত সমুদয় কবিতাবলীর আলোচনা একটি প্রবন্ধে হওয়া অসম্ভব। "হেমচন্দ্রের মিলনের সঙ্গীত অপেক্ষা, বিরহের সঙ্গীত আমাদের নিকট কেন অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়? সুখের আবেগময় সঙ্গীত ছাড়িয়া শোকের বিষাদময়ী গীতি শুনিতে আমাদের প্রাণ কেন আকৃষ্ট হয়? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব জানি না। কোন্ অলক্ষ্য স্রোতে আমাদের জীবন-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা আমরা না

আমাদের প্রাণ কি যেন চায়, পায় না। কোন্ সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছি, আবার কবে সেই দেশে যাইব, জানি না। কাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, আবার কবে কাহাকে ফিরিয়া পাইব, বুঝি না, জানি না। কি যেন ছিল, কিন্তু তাহা আর নাই। কে যেন প্রাণের ভিতর হইতে অস্পষ্ট মধুরস্বরে ডাকিতেছে, শুনিয়াও শুনি না। তাই সংসারে কিছু ভাল লাগে না। একটা চিরন্তন অভাব যেন প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাই সুখের কথা, সুখের গীতি ভাল লাগে না। প্রাণের ভিতর মর্ম্মান্তিক যাতনা, নৈরাশ্যের ঘোর হাহাকার, তাই বিষাদের গীতি শুনিতে প্রাণ আকুল হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাবণের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, উৎসব-গীতি ভাল লাগিবে কেন? তাই সুন্দর-পুষ্প-শোভিত অশোক-তরু দেখিয়া হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন :—

"তরু রে! আমার মনঃ, তাপ দগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা,
আমি, তরু জগতের স্নেহ-সুখ-হারা।
জায়া বন্ধু পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা,
মনে ভাল কেহ মোরে বাসে না তাহারা।

* * * * * *

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের দুঃখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যতদিন নাহি যাই বৈতরণীতীরে।" *

বিজ্ঞান ও কবিত্বের সংমিশ্রণে যে কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে—'বৃত্র-সংহারে'—তাহাই উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন

* "বঙ্গভাষা" বৈশাখ, ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ।

করিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যের কোন কোন স্থলে মেঘনাদবধের ছন্দঃ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে বৃত্র-সংহারের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। আর—এইরূপ সাহায্যগ্রহণও অপরিহার্য্য। কেন না, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র—উভয়েই সমকালিক কবি, এবং কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার আদর্শ ও পথপ্রদর্শক, কিন্তু বৃত্র-সংহারের কোন কোন বিষয় যে, মেঘনাদবধের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ইহা হেমচন্দ্রের সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নহে। হেমচন্দ্র, বৃত্র-সংহারে যে সকল চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতীব মনোহর ও স্বাভাবিক। তাঁহার ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, শচী, বৃত্র ও রুদ্রপীড়কে আমরা ভুলিতে পারিব না। ইন্দ্রের দধীচির আশ্রমে গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন এবং দেবগণের হিতার্থ দধীচির কলেবর পরিত্যাগের ন্যায় উদার, গম্ভীর ও সকরুণ দৃশ্য বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় আর কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই; সর্ব্বোপরি হেমচন্দ্রের এই মহাকাব্যে যে প্রজ্বলিত স্বদেশানুরাগ-বহ্নি, যে পবিত্র আর্য্য-ভাব, যে বজ্র বিদ্যুন্ময় সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, বঙ্গভাষার আর কোন কাব্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৃত্র-সংহার কবির চমৎকার-জনক সৃষ্টি। এই কাব্যে ব্রাহ্মণের অনন্ত মহিমা পরহিত-ব্রতের অতুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা। অসীম ধৈর্য্যসহকারে, তিনি বৃত্র-সংহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। বৃত্র-সংহার বঙ্গসাহিত্যের একটি উজ্জ্বলরত্ন, জাতীয় সাহিত্যের গৌরব। মাইকেলের মেঘনাদবধ এবং হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার, এই দুইখানিই আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতার তুলনায়, মেঘনাদবধ অপেক্ষা বৃত্রসংহার উৎকৃষ্ট,—অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন। বৃত্র-সংহার কাব্যের বীর্য্যবহ্নিপূর্ণ জ্বালাময়ী উক্তি শ্রবণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। বৃত্রাসুর-বিনাশের মন্ত্রণায় দেব বৈশ্বানর, দেবসেনাপতিকে বলিতেছেন :—

> "অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি, পুষ্ট কলেবর,
> অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে,
> তার চেয়ে শত বার পশিব গগনে,
> প্রকাশি' অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে,

ভাসিব অনন্ত কাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।"

বৃত্র-সংহার কাব্যের প্রধান নায়িকা ইন্দুবালা;—মেঘনাদ বধের প্রমীলার সহিত ইন্দুবালার তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রমীলার হৃদয় স্বার্থময়, প্রমীলা বীরভাবে গর্ব্বিতা; ইন্দুবালার স্নেহ স্বার্থশূন্য, হৃদয় কোমল। সে হৃদয় দয়া-ধর্ম্মবিনির্ম্মিত; অপূর্ব্ব চারুচিত্র। পতি, রণে উন্মত্ত,—বহুসংখ্যক প্রাণিনাশ করিতেছেন, ওদিকে পতির হস্তে অন্য রমণীর প্রাণপতি গতায়ু হইয়াছে। রমণীর বৈধব্য ঘটিয়াছে। সেই দুঃখ ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্দুবালা বলিতেছেন :—

"পুত্র-শোকাতুরা আহা মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া, বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন;
ভগিনীর খেদ-স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!
হায়, সখি! বল তোরা—বল কি উপায়ে,
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি,
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।"

যিনি পরহিতব্রতধারী—তাঁহার গুণে ও পুণ্যে, স্বর্গচ্যুত অমরবৃন্দ আবার সুরলোকে প্রবেশ করেন, এবং তিনি নিজে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। বৃত্র-সংহারের পরহিত ব্রত এমনই মহৎ, এমনই শক্তিযুক্ত, ব্রাহ্মণের নিষ্কাম যোগ এমনই মহীয়ান্ যে, দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পরহিতব্রত ব্রাহ্মণের কৃপায়, ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগে, তাহা লাভ করিতে পারেন। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তিধর্ম্মস্য শাশ্বতী।" ব্রাহ্মণের দেহ, সনাতন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি।

ব্রাহ্মণ, পরহিতে নিজ প্রাণ দিতে কখনও কাতর নহেন। তাই মুনীন্দ্র দধীচি বলিতেছেন :—

"এ ভবমণ্ডলে—
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বরদেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে?
লভি' জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?
হে শিষ্যমণ্ডলী—
জগত-কল্যাণ, হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ, এ জগতীতলে।"

আবার দেখুন, দধীচির প্রাণ-বিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব দৃশ্য :—

"বাহিরিল ব্রহ্মতেজঃ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি',
নিরুপম-জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি',
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীরে
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি'
পুষ্পাধার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি'!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।"

ভারতে যেদিন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পরহিতব্রতে তনু ত্যাগ করিতে পারিবেন,—সেই দিন দেবতারা সুরলোকে প্রবেশ করিবেন। সংসারে মাতা ও পুত্রের পরস্পর যে কি প্রগাঢ় স্নেহসম্বন্ধ,—তাহা শচীর খেদোক্তিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে :—

"সখি রে বাসব-সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীর-প্রসবিনী।
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ-অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।

তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসীত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়।
এত কহি' ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মনঃ দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ॥"

বৃত্রসংহার-কাব্যে ইন্দুবালা-চরিত্র হেমচন্দ্রের অতি উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এমন বিশ্বজনীন সহানুভূতি,—শক্রর প্রতিও আন্তরিক অকপট স্নেহ, এমন বিশ্বব্যাপিনী করুণা,—পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যিনি ফুটাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি সাধারণ নহে। হেমচন্দ্রকে তাই আমরা বঙ্গসাহিত্যের প্রধান কবির আসনে বরণ করিতে সমুৎসুক। ইন্দ্রাণীর শোকে কাতর হইয়া, দৈত্য-কুলবধূ ইন্দুবালা বলিতেছেন:—

"আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই—
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন,
বিপদে শচীর সম!"

দেবাসুরে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে; ইন্দুবালা প্রতিক্ষণে কাতর অন্তরে ভাবিতেছেন, তাহার স্বামী মহাবল রুদ্রপীড়ের হস্তে অসংখ্য দেবসৈন্য নিহত হইতেছে;—সহসা দনুজদলে হাহাকার উঠিল; কিন্তু পরদুঃখ-কাতরা ইন্দুবালা ভাবিল, এবারও তাহার স্বামী কোন দেবতাকে নির্য্যাতন করিয়াছে:—

"জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি',
কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে, সুখের সংসার?
চপলা অস্ফুটস্বরে রুদ্রপীড়-নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন, শ্রবণের মূলে,—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে!

শুকাইলা ইন্দুবালা, নিদাঘের ফুল!
হায় রে! সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে ফুটিবে না আর!
ছিন্ন যেন শচী-কোলে লাবণ্যের হার।

কবি এইরূপে তাঁহার মানসপ্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

বৃত্রসংহারের ইন্দুবালা ও মেঘনাদবধের প্রমীলা, উভয় চরিত্রে কত প্রভেদ, পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনা করিলে অবশ্যই বুঝিবেন, দেবীতে ও মানবীতে যত প্রভেদ, ইন্দুবালায় ও প্রমীলাতে তত প্রভেদ। ইন্দুবালার চরিত্রে বিন্দুমাত্র দোষ দৃষ্ট হয় না; সে চরিত্র—পবিত্র, নির্ম্মল, কোমল, প্রীতিকর। কবি, নির্দ্দোষ তুলিকায় সে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সুপবিত্র ভাবের সহিত বিশুদ্ধ চিন্তাশীলতার সংযোগ! এরূপ মণিকাঞ্চন-সংযোগ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। মেঘনাদ-বধ কাব্যের আদর্শ চরিত্র প্রমীলাকে কাব্যকর্ত্তা নির্দ্দোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু বীররসে পবিত্র প্রেম অঙ্কিত করিতে গিয়া কতকটা অসার পার্থিব প্রেমভাব আনয়ন করিয়াছেন।

উভয় কবির তুলনায় কাহারও দোষকীর্ত্তন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মেঘনাদবধ-কাব্যে বহুরত্ন আছে। কাব্যের গুণ আলোচনা করিলে মেঘনাদ

বধে বীররসের বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মেঘনাদ-বধের তুলনা মেঘনাদ-বধ, বৃত্রসংহারের তুলনা বৃত্রসংহার।

ভক্তিরসাশ্রিত কবিতাতেও হেমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার প্রভা সুপ্রকাশ। দশমহাবিদ্যায়, দেবর্ষি নারদের চিত্রে হেমচন্দ্র উচ্চস্বরে ভক্তি-গীতি গাহিয়াছেন ঃ—

"আনন্দধ্বনি করি',— মুখে বলি' হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেনকালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেতন বিভু-গানে ত্রিভুবন-ভ্রমণে ॥
কে বা হেন মতিমান্, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্‌ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে ?
হর-হরি-ব্রহ্মন্, সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কি বা জনমিল কারণে ?
মানব কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড়-সনে সঞ্চারে কি বা বিধি-মননে ?
সুখ কি জীবিত মানে ? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে ?
কা' হ'তে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার,
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা ?
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ নভঃ, ভিন্ন কি একি সব,
'পঞ্চ কি আদিভূত অগণন গণনা ?
সেই তর্ক-নিরূপণ, করিবারে কোন্ জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা ?

গাও বীণা হরি-গান, দুর্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন-সুখে, হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোকে প্রকটিত হরষে॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কি বা সাধুজন-জীবনে!
ধরম ধরমপুর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী, শুনায়ে জাগায়ে প্রাণী,
সু-স্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে যে গুণময়, যাঁহাতে এ সমুদয়,
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন্, সপ্তমে তুলি' তান,
নারদ মনোমত-ধ্বনি বীণা বাজ রে।

এইরূপ সনাতন ধর্ম্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা যিনি গাহিতে পারেন,—তিনি সুধন্য! বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কাব্য অমর,—কাব্যকারও, চির-অমর। ফলতঃ—হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অপিচ—

"রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর, তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥"

হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার এই যে শিব-বিলাপ, ইহা অতি অপূর্ব্ব। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, হেমচন্দ্রের অধিক সুখ্যাতি করিব কোন্ বিষয়ে? তাঁহার স্বদেশানুরাগপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী কবিতার, না এইরূপ ভক্তিগীতিকার?

ভাব-বিভোর নারদ দশমহাবিদ্যায়, আদ্যাশক্তি ভগবতীর দশরূপের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, মায়ামুগ্ধ জীবকে সান্ত্বনা করিতেছেন :—

"জগৎ অনন্ত নয়, কালেতে হইবে লয়,
জীবে দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার, আনন্দে নিনাদ তার,
সত্য পথে রাখি মন, অনাদ্যের স্মরণে।
লিখি' বুকে মোক্ষনাম, পূরা জীব! মনস্কাম,
নিখিল নিস্তার পাবে শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি' তারি পথ, চালা নিত্য মনোরথ,
জীব-জন্মে ভয় কি রে? জগদম্বা জননী॥"

অনেক স্থল হইতে এইরূপ অনেক রসময়ী কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্থানাভাব বশতঃ ও বাহুল্যভয়ে উৎকৃষ্ট স্থলগুলি উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা বঙ্গসাহিত্যের এক অতি উজ্জ্বল-রত্ন। জননী জন্মভূমিকে হেমচন্দ্র যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—আপন পর ভাবেন নাই; জীব দুঃখেও তিনি সেইরূপ কাঁদিতে জানিতেন এবং সেই দুঃখ বিমোচনের প্রকৃষ্ট পথ পাইবার উদ্দেশ্যে করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা "চিত্তবিকাশ।" উহার কবিতাগুলি, তাহার পূর্ণ বিকাশের পরিচায়ক।

হেমচন্দ্রের ভক্তিভাব স্বাভাবিক, তাই তিনি উত্তর জীবনে অশেষ দুঃখ-কষ্টে—মনস্তাপে প্রপীড়িত হইয়াও ভগবদ্বিশ্বাসে আস্থাশূন্য হন নাই; আস্থা বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। তিনি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছিলেন, বিধাতার বিধানে নির্ভর না করিলে জীবের গত্যন্তর নাই; কেন না, মূল অদৃষ্ট ও জন্ম-জন্মার্জিত কর্ম্মফলে জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভগবানের দৈব কৃপা ব্যতীত জীবের পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। অবস্থার পরিবর্ত্তনে কবি মর্ম্মান্তিক শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"নিজ পুত্রকন্যামুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পান না।

অপূর্ব্ব ভাবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হ'বে,
ভবলীলা ঘুচে'ছে আমার ;
বৃথা এবে এ জীবন হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই—বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু কি দশা হ'বে আমার ?"

কবি আবার আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্থানান্তরে বলিয়াছেনঃ—

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে,
ঘটে'ছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি ?
* * * *
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা ? কোথায় দ্বারকা ?
এস ভগবান, কর ধৈর্য্যদান,
* * * *
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ,
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজকর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।"

এইরূপে জীব-জগতের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, ঈশ্বরে নির্ভরই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া, ভাবে গদ্গদ চিত্তে কবি বলিয়াছেন :—

"জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ডতারণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন !
চরণে করিয়া নতি, বলি হে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।"

বঙ্গ-সাহিত্যে যদি কোন কবি, আমাদের জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন, তবে সেই শ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি—আমাদের প্রিয় কবি হেমচন্দ্র। কাব্য আলোচনা করিলে জানা যায়, হেমচন্দ্রের রুচি আদ্যন্ত পরিমার্জ্জিত। যে অবৈধ প্রণয়-প্রসঙ্গ বর্ত্তমান কালের অস্থি মজ্জা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার নাম-গন্ধও হেমচন্দ্রের কাব্যে নাই। সংযত সুপবিত্র ভাবের সন্নিবেশ হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার চিত্রিত বৃত্রাসুর ও শচীদেবীর চিত্র মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। মাইকেল মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের চরিত্রাবতারণা অনেকাংশে প্রশংসনীয়; বৃত্র-সংহার-কাব্যে শচীর চরিত্র এতদ্বিষয়ে দেদীপ্যমান উদাহরণ। ইন্দুবালার চিত্রও পবিত্র, সুতরাং অতীব রম্য। *

হেমচন্দ্র উত্তম অনুবাদক। দৃষ্টান্তস্থলে, বক্তব্য—"মদন পারিজাত" আলেক্জাণ্ডার পোপের Eloisa to Abelard এর অনুবাদ; "কমল-বিলাসী" টেনিসনের Lotus eaters এর অনুবাদ; "ইন্দ্রের সুধাপান" ড্রাইডেনের Alexander's feast এর অনুবাদ ইত্যাদি—উল্লেখযোগ্য কবিতাগুচ্ছ সুন্দর পদ্য কবিত্বময় বঙ্গানুবাদ। কবি হইলেই মানুষ স্বভাবতঃ সুরসিক হয়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রসিকতায় প্রচলিত সামাজিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কবিবর হেমচন্দ্র সমাজপ্রিয়, অথচ উদারসামাজিক। "কুলীন মহিলার বিলাপ" দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়, হেমচন্দ্র সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্র এই কবিচতুষ্টয়ের

* "সাহিত্য-সভার" কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য।

কবিতাগুলির তুলনায় উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা বরাঁ গুরুতর কথা, অতএব তৎকল্পে বিরত থাকা উপস্থিত ক্ষেত্রে অশোভন বিবেচিত না হইবারই কথা। তৎ বক্তব্য এই যে, আমাদের ধারণা—বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের রচনা চিরস্থায়িনী হইবে।

হৃদয়োন্মাদিনী শক্তি যাহাতে নাই, তাহাকে কবিতা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের রচনায় এই শক্তি প্রভূত পরিমাণে ছিল। তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত ছিল, অতএব সামাজিক সুপ্রথার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিলে তিনি নীরব থাকিতে পারিতেন না; সেরূপ ব্যবহার-সম্বন্ধে তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী তীব্র শ্লেষ উক্তি ধারা পরিবর্ষণ করিত। ভবানীপুরে যুবরাজের অর্চ্চনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাঙ্ রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥"
"ফিব্রু" দানে এক তাড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
গাছ, কাতুরে ভেকো হলো কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥"

হেমচন্দ্রের কাব্যাদি-সম্বন্ধে সাহিত্যানুরাগী স্বদেশপ্রিয় রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বলেন,—"হেমচন্দ্রের কাব্যকল্পনার উচ্চতা এবং ভাবের গভীরতার নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য সুবিখ্যাত। তাঁহার কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। কেবল মাধুর্য্য কিংবা গাম্ভীর্য্যই তাহার গুণ নহে। উহাতে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি অভিব্যক্ত। হেমচন্দ্র স্বদেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার 'ভারতসঙ্গীত' স্বদেশপ্রীতির জলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালীর হৃদয়-গ্রাহী এবং রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় উহার শিক্ষা বাঙ্গালী-হৃদয়ে সুফল উৎপাদন করিতেছে এবং করিবে। বঙ্গসাহিত্য হেমচন্দ্রের নিকট কত ঋণী, তাহা অবর্ণনীয়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতার যথাযথ পরিস্ফুটরূপে আলোচনা করিয়াছেন।* তিনি

* রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কবিবর হেমচন্দ্রের বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া, মফঃস্বলের মধ্যে ঢাকায় প্রথম

বলেন—"হেমচন্দ্র মহাকবি"। "মহাকবি" এই অভিধান, সকল ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রে একভাবে বর্ণিত নয়। কিন্তু হেমচন্দ্র সকল ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত "মহাকবি"। বঙ্গভাষার পুষ্টির তিনটি পথ—অনুবাদ, অনুকরণ এবং উদ্ভাবন, যুগপৎ তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপন উদ্ভাবনীশক্তির গৌরবে অলঙ্কৃত হইয়া তিনি অনুকরণ অনুবাদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি তুলসীদাস, সেক্সপিয়র, শেলি প্রভৃতি—কাহারও দ্বারস্থ হইতে ঘৃণাবোধ করেন নাই। তিনি বিহঙ্গের ন্যায় যথা তথা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া আপন মাতৃভাষারূপ-নীড়ে সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, কিন্তু তাহাতে জ্বালা নাই, উহা স্নিগ্ধ মধুর। প্রাণমনঃ উহাতে সুশীতল করিয়া দেয়। সকল রসে সমান ক্ষমতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি যেমন জলদগম্ভীর রবে ভেরী বাজাইয়া প্রাণমনঃ মাতাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার গম্ভীরস্বরে তেমনই দেশ কাঁপিয়াছে। আবার তাঁহার হাস্যরসপ্রাচুর্য্যসমন্বিত কবিতাবলীতে স্বদেশের লোকে প্রাণের হাসি হাসিয়াছে। করুণরসেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা। তিনি যুবক যুবতীর মনোমোহিনী লালসা যেমন ফুটাইয়াছেন, আবার শান্তিরসের কবিতায় শান্তি ও মুক্তিপ্রার্থী পাঠকের মনঃ প্রাণ তেমনই মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মকাব্য রামপ্রসাদাদি সাধকের কবিতার ন্যায় অতি মধুর, ভাব-বিভব পরিপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ। হেমচন্দ্রের সামাজিকতা ও স্বদেশপ্রীতির বর্ণনা অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্র সমস্ত সমাজের প্রতি সমান সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কোমল প্রাণ দেশের জন্য বাস্তবিকই কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার

সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে প্রথম সাহায্য করেন; ঢাকায় তাঁহার উদ্যোগে ও কলিকাতায় 'সাহিত্য-পরিষদ্' এবং 'সাহিত্য-সম্মিলনের' আন্দোলনের ফলে, কবিবর হেমচন্দ্র দেশের লোকের নিকট হইতে প্রায় ১২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত প্রথিতনামা "হিতবাদী" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া, নিজের উদারতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। শুভ আন্দোলনের ইহা শুভ ফল সন্দেহ নাই।

জাতীয় কবিতা দেশের যাবতীয় সুধীবৃন্দের চিত্ত-স্থল প্রকৃতই বিহ্বল করিয়াছিল। কবি কলিকাতা খিদিরপুরস্থ ভবনে যোগীর ন্যায় বাস করিতেন। তাঁহার শান্তজীবন যথার্থই শান্তিপ্রিয় ঋষির ন্যায় ছিল। হেমচন্দ্রের কল্পনা কোনও কোনও স্থানে বাল্মীকিকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি কবিত্বের প্রতিভা লইয়া তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে, অমরকীর্ত্তি মধুসূদন অবশ্যই হেমচন্দ্র হইতে উচ্চতর পদবী রূঢ়; হেমচন্দ্র শব্দ-সম্পদে দরিদ্র; সময়ে সময়ে একটু কর্কশ এবং কোন কোন স্থানে রস-শূন্য। কিন্তু যদি কাব্যের পারম্পরিক উৎকর্ষ লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার,—মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বৃত্র-সংহারে যাহা ফলিয়াছে, মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার-দোষে মেঘনাদে তাহা ফলে নাই। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারে মধুসূদনের চরিত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব চিত্র দেখাইয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ-বধে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।"

কালীপ্রসন্ন বাবু সংক্ষেপে হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের যাবতীয় সুপণ্ডিত সুধীমণ্ডলীর মতে তাহাই প্রকৃত। হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল ও আছে। আমাদের স্বজাতীয় সাহিত্য এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই; পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় আসিয়াছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ।

কবি হেমচন্দ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহার রুচিও ব্রাহ্মণোচিত সুমার্জ্জিত ছিল। হেমচন্দ্র ইংরাজীতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ব্রাহ্মাচার্য্যপ্রধান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ, মহাশয় বলেন :—

"বারন্‌স্ যেমন স্কটলণ্ডবাসীদিগের জাতীয় কবি, বারন্‌স্ যেমন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রবেশ করিয়াছেন, হেমচন্দ্রও তেমনি বাঙ্গালীর জাতীয় কবি, তাই তাঁহার কাব্য বাঙ্গালীর প্রাণের সামগ্রী, অতি প্রিয় পদার্থ। হেমচন্দ্র বারন্‌সের ন্যায় জাতীয় ভাব তাঁহার ভাষায় সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর প্রাণ মন নাচাইয়া দেয়। জাতীয় আশা, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। প্রাচীন কবিদিগের আশার যে সীমা ছিল, এখন তাহার অধিকতর প্রসার হইয়াছে; হেমচন্দ্রের কবিতাও ততদূর বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায় তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও চিত্রণ-শক্তি অবর্ণনীয়। সামান্য একটি পদার্থ দেখিয়া যিনি প্রকাণ্ড চিত্র আঁকিতে পারেন, যিনি সামান্য বিষয় হইতে আপনার বিশাল কল্পনার প্রচুর উপকরণ পান, তিনিই মহাকবি। হেমচন্দ্রের পদ্মের মৃণাল বৃক্ষ, ইত্যাদি কবিতা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রাচীন কবিদিগের সময়ের প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত একটি সেতুর সৃষ্টি হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাহার দুই দিকের দুইটি তীর।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিয়োগে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;—

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।"

হায় হায়! যার-পর-নাই পরিতাপের বিষয়, হেমচন্দ্রের নিজের এই উক্তিটি তাঁহার নিজের জীবনেই প্রযুক্ত হইয়া গেল! শেষ জীবনে বহুকষ্ট ভোগ করিয়া—১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে কবিবর হেমচন্দ্র সংসার-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

এ নশ্বর সংসারের সব যায়, থাকে কেবল স্মৃতি আর কীর্ত্তি। স্মৃতি ও কীর্ত্তি কাল-স্রোতে ভাসিয়া যায় বটে, কিন্তু যতদিন সমাজ ক্ষেত্রের উপর বিদ্যমান থাকে, ততদিন সমাজ দেহকে সজীব করিয়া রাখে। হেমচন্দ্রের কাব্যকীর্ত্তি যতদিন বঙ্গ-সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার প্রতিভার স্মৃতিও বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তাঁহার জীবন-কথা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার জ্যোৎস্না-রেখা অনন্ত কালের কোলে স্থির দামিনী দীপ্তির ন্যায় পরিস্ফুট থাকিবে।

"নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

সংসারে মানব-জন্ম দুর্লভ, মানব-জন্মে আবার বিদ্যা সুদুর্লভ ; বিদ্যাবান্ মানবের কবিত্ব দুর্লভ, কবিত্ব-শক্তি আরও সুদুর্লভ।

এই সুদুর্লভ শক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি মানব হইলেও দেবতা। কীর্ত্তিমান্ কবি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দেবতারূপে পূজা করিতেছি, তাঁহার দেবত্ব স্মরণ করিয়া, তাঁহার বিয়োগ-শোক আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি।

শোক-সঙ্গীত।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ, ধৈর্য্যহারা কার তরে?
সকলে একত্র মিলি, কি হেতু রোদন করে?
হৃদয়ে মূরতি আঁকা,
বিষাদ-কালিমা-মাখা,
সবার বদন কেন,—
নিরখি নয়ন ঝরে!
কাহার বিরহবাণ পশিছে হৃদি-ভিতরে!
কবি হেমচন্দ্র নাই! সবাই কাঁদিছে তাই,
হাহাকার করিতেছে, নিদারুণ শোকভরে;—
চলি' গেল হেমচন্দ্র, কোন্ দেশে কার ঘরে?
জগতে অমর কবি, বিকাশি' বিমল ছবি,
সুরম্য অমরপুরে, আনন্দে বিরাজ করে॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

দে মা, দীন-দয়াময়ি, দে মা পদাশ্রয়!
কোলে তুলে' নে মা শ্যামা কবীন্দ্রতনয়।
সুরে সুরে কেঁদে কেঁদে, স্বদেশের ব্রত সেধে',
গিয়াছে মা তব কাছে, দেহ মা তারে অভয়॥
আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে, প্রবোধ নাহিক মানে,
চাহি মা যে দিকপানে, হেরি অন্ধকারময়;—
তব শান্তি-নিকেতনে, সদা আনন্দিত মনে,
মা তোমার শ্রীচরণে, কবি যেন সুখে রয়॥

ইমন্ কল্যাণ—আড়া।

দেশবন্ধু হেমচন্দ্র স্বর্গধামে পশিল।
খেলাধূলা সাঙ্গ করি' খেলা-ঘর ভাঙ্গিল॥
গাও সবে জয়-গান, কবি-গৌরবের সুরে;—
বাড়া'তে কবির মান, কালী কোলে করিল॥
হেমের ললিত গানে, মুগ্ধ হ'য়ে মহাপ্রাণে,
শান্তিময় কোল দানে, মা তাহারে তুষিল॥ *

* "সাহিত্য-সভার" চতুর্থ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে, সভায় বিরচিত সঙ্গীতদ্বয় গীত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র কোথা ?

"I shall never see you, who was * * * every one's friend, any more !"

LYTTON'S EUGENE ARAM.

"He is fallen ! he is gone !
In the world I left alone,
Ah ! ——————"

PARKER

(১)

হেমচন্দ্র কোথা ?—কাব্যের কোকিল,
কাব্য-কুঞ্জবনে কূজন যার—
তানে তানে তানে মাতাইত চিত,
মধুরে বাজিত হৃদয়-তার !

(২)

কোথা সে কোকিল লুকা'ল এখন,
সে কল-কাকলী না শুনি কেন ?
যেদিকে নেহারি, দেখিতে না পাই,
কাব্য-কুঞ্জবন আঁধার যেন !

(৩)

না, না, না, না, না, না, একি কথা বলি ?
কেন ভ্রান্ত হয়ী পাগল মন ?
কেন লুকাইবে, লুকাইবে কোথা,
হেম কিবা লুকাইবার ধন !

(৪)

পশেছে ত্রিদিবে ত্রিদিব-ভূষণ,
জুড়ায়েছে যত ভবের জ্বালা।
নিত্যানন্দধামে আনন্দ লভিছে,
অপ্সরা সঁপিছে কুসুম-মালা !

(৫)

হেসে হেসে যবে কেটেছিল দিন,
ওকালতি পদে কতই মান—
লভেছিলে কবি ! অর্থ রাশি রাশি,
কাঙ্গাল গরীবে করেছ দান !

(৬)

তখনো কেঁদেছ স্বদেশের দুখে,
কেঁদে কেঁদে কত গেয়েছ গীত !
'ভারত সঙ্গীতে' সেই অশ্রুধারা—
হুতাশনে জ্বলি দহেছে চিত ?

(৭)

হেমচন্দ্র ! কহ স্বরগ ভেদিয়া,
সত্য কি না যাহা কহিনু আমি ?
চক্ষু-রত্ন-হারা ছিলে মরধামে,
লয়েছেন কোলে অখিল স্বামী !

(৮)

সেই তুমি হায় ! জীবনের শেষে,
পেয়েছ অন্তরে যাতনা কত ;
দীপ্তিহীন নেত্রে ফেলি অশ্রুধার,
যাপিয়াছ দীন ভিখারি মত !

(৯)

তবু কাঁদিয়াছ স্বদেশের তরে
চিরদিন ছিলে হিতেতে রত,
কণ্ঠাগত প্রাণ, তবু কাঁদিয়াছ,
কে আর কাঁদিবে তোমার মত ?

(১০)

কাঁদিয়াছ কবি, যাহাদের তরে,
উঠ জাগ বলি কাতরে ডেকে,
তাহারা ত কেহ শোনে নাই কথা,
ঘুমায়ে রয়েছে জাগিয়া থেকে !

(১১)

নাই বা শুনিল, ক্ষতি কিবা তায়?
অবশ্য সময়ে আসিবে দিন,
যবে তব বাণী বিতরিবে ফল,
রবে না ভারত এহেন হীন?

(১২)

হেমচন্দ্র! তুমি গিয়াছ স্বরগে,
চর্ম্মচক্ষে আর দেখা না পাই,
সে নয়ন মুদি ভক্তিনেত্র খুলি',
জ্যোতির্ম্ময় তোমা দেখিতে পাই!

শ্মশানে।

"কৃতে ধর্ম্মে ভবেৎ কীর্ত্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্।"

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

"Now they were speaking of him as dead. He was not dead. He lived, not only he lived among them, in his spirit of self-consecration and the beauty of holiness, but he was alive to-day, more alive than he was in that flower of his youth even."

REV : DALL.

আছিল জীবন, না ছিল নয়ন,
তথাপি যখন মুদিলে আঁখি,
হিম কলেবর, শুব্ধ তারস্বর,
উড়ে গেল যবে জীবন-পাখী।
মিলি বন্ধুজন, সে দেহ তখন,
সুরধুনী তীরে লইয়া এলো,

শ্মশানের ঘাটে, ভিজে কাঁচা কাঠে,—
সেই হেম দেহ * পুড়িয়ে গেলো।
সমাপি সৎকার, হয়ে শুদ্ধাচার,
ঘরে গেল সবে চুকিল গোল,
কিছু কিছু নয়, সব শূন্যময়,
বাতাসে মিশিল বোল হরিবোল!
খাজিল না খোল, ফাঁকা হরিবোল,
বল রে হরি, হরি হরিবোল!
হেমচন্দ্র-শোকে, গৃহবাসী লোকে
তুলিল দু-দিন রোদনের রোল!
দেহ ভস্মসার, ক্রন্দন অসার,
ক্রন্দন বিফল মায়া!
সব নিভে যায়, দু-দিনে ফুরায়,
প্রাণ যবে ছাড়ে কায়া!
হেমচন্দ্র কবি, বঙ্গ পদ্মরবি,
অস্তাচলে চলি গেলা।
সেই নাম স্মরি, বন্ধুরূপ ধরি,
কেঁদে লও এই বেলা!
সভ্য ভাই সব, থেক না নীরব,
'কাঁদিবার সভা কর'!
বক্তৃতায় কেঁদে, স্নেহে বুক বেঁধে,
সভ্যতার ধ্বজা ধর!
বেশ কাঁদিয়াছ, ভাব লাগায়েছ,
ধন্য ধন্য ভালবাসা!
কাঁদিতেই হয়, মনে যেন রয়,
কাঁদিবারে ভবে আসা!
শ্রাদ্ধ-বিধি আছে, সবাকার কাছে,
সে বিধি পালিতে হয়।

* "হেমদেহ"—হেমচন্দ্রের দেহ।—অর্থান্তরে স্বর্ণদেহ। মাটীর দেহ হইলেও কবির দেহকে সোণার দেহ বলাই অভিপ্রেত।

তিনদিন পরে,　　কন্যা শ্রাদ্ধ করে,
"চতুর্থ" তাহারে কয়॥
বর্ণ অনুসারে,　　ক্রমশঃ সবারে,
দিনে দিনে শ্রাদ্ধ করে।
করিতেই হয়,　　না করিলে নয়,
বিশেষ হিন্দুর ঘরে॥
আজিকার কালে,　　সভ্যতার চালে,
বক্তৃতায় শ্রাদ্ধ হয়!
পচা পুরাতন,　　আচার নূতন,
হ'ক সভ্যতার জয়!!

মুক্তি।

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।"—কঠোপনিষৎ।

কারাবাসী যেইদিন কারামুক্ত হয়,
মনে কর তার প্রাণে কত সুখোদয়!
দেহ-কারামুক্ত হয়ে ভব-জীব-প্রাণ,
বাতাসের সনে করে স্বস্থানে প্রস্থান।
ভাব দেখি সেইদিন কি আনন্দ তার,
ধরায় ফিরিতে সে কি ইচ্ছা রাখে আর?
মরণে নির্ব্বাণ মুক্তি যুক্তি দেন যাঁরা,
সত্য সত্য সংসারের শান্তিদাতা তাঁরা।
কতশত খেলা করে, ভেঙ্গে খেলা-ঘর,
পশেছেন মুক্তিধামে মুক্ত কবিবর।
কবিবর হেমচন্দ্র মরিয়া অমর,
অমরের মৃত্যু নাই, সম-পূর্ব্বাপর।
ভব শাস্ত্রে লেখা আছে, মোহিও না শোকে,
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইহপরলোকে।
কীর্ত্তিমান্ হেমচন্দ্র অক্ষয় অমর,
মুক্তিধামে হেমচন্দ্র বঙ্গ কবিবর।

ভাবিতে তাঁহার রূপ ইচ্ছা যদি হয়,
স্মরিতে হেমের গুণ মনে যদি লয়।
কীর্ত্তি আলোচনা কর, মাতিয়া কৌতুকে,
উল্লাসে হেমের গুণ গান কর মুখে।
শোকসভা কেন ভাই, কান্না কি কারণ ?
মুক্ত-পুরুষের জন্য নিষেধ রোদন।
কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিতে রূপ, কীর্ত্তিগুণময়,
কীর্ত্তিপটে দেখা পাবে হেমের উদয়।
ছোট ছোট কীর্ত্তি নয়, স্বভাবে প্রকাশ,
পদে পদে পরিচয় হৃদয় উচ্ছ্বাস।
তোমাদেরি হিতব্রতে সমর্পিয়া প্রাণ,
স্বদেশের দশাগীতি করেছেন গান।
গানের তরঙ্গ ছোটে ভারত-সাগরে,
চেয়ে দেখ সে তরঙ্গ সানন্দ অন্তরে।
পার যদি, সে তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে যাও,
বামাদের মত কেন কাঁদিয়ে ভাসাও ?
পেয়েছ পুরুষ-জন্ম, পুরুষত্ব ধর,
মিছামিছি কেঁদে কেঁদে কেন তুমি মর।
কেঁদ না কেঁদ না ভাই করি নিবেদন,
চিরজীবি হেমচন্দ্র, কবি-সিংহাসন !
কীর্ত্তিতে কবির বাণী আলোচনা করি,
"ভারত-সঙ্গীত" খানি হৃদয়েতে ধরি,
গাও কবীন্দ্রের গুণ, গাও প্রাণ ভরি,
পাল কবীন্দ্রের বাক্য, বল হরি হরি !
সম্বর রোদন ভাই, সম্বর রোদন,
দেখাও দশের বল, শান্ত কর মন।
স্বর্গধামে পশেছেন হেমচন্দ্র দ্বিজ,
আপন মঙ্গল সবে সাধ নিজ নিজ।
মঙ্গল সাধনে হবে দেশের মঙ্গল,
চক্ষুজল ফেলে কেন ডাক অমঙ্গল !
আমি এইখানে আজ পালা সাঙ্গ করি,
আইস আমার সঙ্গে বল হরি হরি !

সমাপ্ত।